নবাব কলকাতায়, তিনি অওধে

তিনি ওয়াজিদ আলি শাহের বেগম । নাবালক পুত্রকে নবাব ঘোষণা করে অওধের মসনদ সামলেছিলেন, সাধারণ মানুষকে একজোট করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। আজ তাঁর মৃত্যুদিন।

৭ এপ্রিল, ২০১৯,
সাবির আহমেদ

সাহসিনী: লখনউয়ের মণিপাল পাবলিক স্কুল হজরত মহলের এই ছবিটি উপহার দিয়েছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহের উত্তরসূরি মনজ়িলাত ফতিমাকে। নীচে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ডাকটিকিট

রূপকথার গল্পে রাজকন্যার কথা ভূরি ভূরি, কিন্তু ইতিহাসে শত্রুপক্ষের সঙ্গে একাকী রানির লড়াইয়ের কাহিনি হাতে গোনা। ইতিহাস রচনায় এই মহীয়সী ও সাহসিনীদের স্থান হয় পাদটীকায়। এমনই এক রানি বেগম হজরত মহল। সব ধর্মের মানুষকে একত্র করে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। আজ থেকে ১৪০ বছর আগে, ১৮৭৯ সালে আজকের দিনেই মৃত্যু হয় তাঁর। নেপালের কাঠমান্ডুতে তাঁর নিজের হাতে গড়া মসজিদেই দাফন করা হয় তাঁকে।

হজরত মহলের ছোটবেলা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। ১৮২০ সাল নাগাদ ফৈজাবাদে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত এক দাস পরিবারে জন্ম হয় তাঁর। জন্মতারিখ জানা যায় না। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল মোহাম্মদি খানম। আর্থিক অনটনের কারণেই কৈশোরে তাঁর পিতা নর্তকী হিসাবে অওধের রাজপরিবারে বিক্রি করে দেন তাঁকে। অচিরেই অওধের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের নজরে পড়েন। অন্দরমহলে তখন তিনি ‘মাহাক পরি’ বা সৌন্দর্যের পরি। ওয়াজিদ আলি শাহের আত্মজীবনীমূলক কবিতা ও চিত্র সঙ্কলন ‘ইশক-নামা’ থেকে জানা যায়, এই ‘কালো মেয়ে’র

প্রতি নবাবের বেশ দুর্বলতা ছিল। হজরত মহলের রূপের প্রশংসাও আছে সেখানে। জন্ম নেয় তাঁদের একটি পুত্রসন্তান, বিরজিস কদ্‌র। 'মাহাক পরি' হয়ে ওঠেন 'হজরত মহল সাহেবা' বা 'বেগম হজরত মহল'।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে অস্তগামী মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাদের শাসন ক্ষমতা তখন একেবারেই সীমিত। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। অন্য দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুযোগ বুঝে সুচতুর কৌশলে উত্তরাধিকারীহীন বা দুর্বল রাজাদের হাত থেকে তাঁদের রাজ্য কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করে।

উত্তর ভারতের অওধ সামরিক শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তখনও নিজস্বতা হারায়নি। লখনউ ছিল এই রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ সিংহাসনে বসলে অওধও এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছয়। বিশেষত শিল্প ও কলাবিদ্যার চর্চা রাজ্যে বিস্তার লাভ করে। অবশ্য এই সুসময় দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে উত্তরাধিকারীহীন রাজাদের হাত থেকে রাজ্যের শাসনভার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। লর্ড ডালহৌসির নেতৃত্বে ঝাঁসি, উদয়পুর এবং অওধ-সহ প্রায় একুশটি রাজন্যবর্গ-শাসিত রাজ্য দখল করে নেয় কোম্পানি। ব্রিটিশদের দেওয়া সন্ধির শর্ত পছন্দ হয়নি অওধের নবাবের। শর্ত মানতে অস্বীকার করায় ওয়াজিদ আলি শাহ নির্বাসিত হন কলকাতায়। তাঁর স্বপ্নের শহর লখনউ ছেড়ে গেলেন, পিছনে পড়ে রইলেন অসংখ্য গুণমুগ্ধ প্রজা। নবাবের নির্বাসন যাত্রায় বেগম হজরত মহল সঙ্গী হননি, তিনি লখনউয়েই থেকে গেলেন। শোনা যায়, কলকাতা যাওয়ার আগেই নবাবের সঙ্গে বেগমের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল।

এক দিকে নবাবের অপমান ও নির্বাসন, অন্য দিকে স্বত্ববিলোপ নীতির নামে কোম্পানির সম্পদ লুঠ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জায়গায় জায়গায় অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দানা বাঁধছিল। ধর্মীয় বিভাজনকে অস্ত্র করে দেশীয় রাজ্যগুলিকে আরও দুর্বল করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল ইংরেজরা। ইতিমধ্যে শুরু হয় সিপাহি বিদ্রোহ। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে এক বিশেষ ধরনের কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করেন। বিদ্রোহের আগুন ক্রমশ মেরঠ থেকে কানপুর হয়ে দিল্লি পৌঁছয়। অসন্তোষের আঁচ এসে লাগে অওধের গায়েও। নবাবের নির্বাসনের পরে নেতৃত্বের যে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, তা পূরণ করতে এ বার এগিয়ে এলেন বেগম হজরত মহল। সমাজের সর্ব স্তরে ইংরেজবিরোধী ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ছোটবড় জমিদার, শাসক,

এমনকি কৃষকদেরও সংগঠিত করে ইংরেজদের সমূলে ধ্বংস করার সঙ্কল্প করেন তিনি। গঠন করেন নিজের সৈন্যদল।

হৃত গৌরব ফিরে পেতে ১৮৫৭ সালের জুন মাসে বেগম হজরত মহল চোদ্দো বছরের শিশুপুত্র বিরজিস কদ্‌রকে অওধের নবাব ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে রাজকীয় আড়ম্বর তত ছিল না, কিন্তু বিরজিস কদ্‌র-এর অভিষেক উপলক্ষে রাজপথের শোভাযাত্রায় সব ধরনের মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তা দেখে বেগম হজরত মহলের মনোবল বহুগুণ বেড়ে যায়। সমকালীন তথ্য থেকে জানা যায়, এটা কেবল একটা প্রতীকী অনুষ্ঠানই ছিল না। ব্রিটিশ-বিরোধী সব শক্তি ও দলকে এক সূত্রে বাঁধার কাজটাও করেছিল।

এই মিলিত শক্তির সামনে কোম্পানির বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। ৩০ জুন ১৮৫৭, লখনউ শহরের অদূরে যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী বেগম হজরত মহলের সৈন্যদলের হাতে নাস্তানাবুদ হয়। লখনউ ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত, এই ঘোষণা করা হয়। বেগমের অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের দৃষ্টান্ত তৎকালীন ইউরোপীয়দের নজর এড়ায়নি। উইলিয়াম হাওয়ার্ড রাসেল তাঁর বিখ্যাত 'মাই ইন্ডিয়ান মিউটিনি ডায়েরি'-তে লিখেছেন, ''অভূতপূর্ব শক্তি ও সক্ষমতা প্রদর্শন করেন বেগম। তিনি তাঁর ছেলের রাজ্য রক্ষার স্বার্থকে সর্বজনীন কর্তব্য হিসাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি।'' বেগমের স্বাধীনচেতা মানসিকতা দিল্লির দরবারের শেষ মুঘল সম্রাটের সম্ভ্রম ও স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিল।

প্রাথমিক সাফল্যের পর, বেগম তাঁর পুত্রের নামে একের পর এক ঘোষণা জারি করেন। ইংরেজদের এই মাটিতে আর ঘাঁটি গাড়তে না দেওয়ার শপথ নেন। ইংরেজদের নানা ছল-চাতুরি মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেমন করে একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে, মানুষকে শোষণ করছে, তার অজস্র উদাহরণ তুলে ধরেন সকলের সামনে। সতর্ক করেন, ইংরেজ মরিয়া হয়ে ধর্মীয় আচার-আচরণের উপরেও আঘাত করতে পারে।

১৮৫৭ সালের শেষ দিকে পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। যে জায়গাগুলোয় বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, ইংরেজরা সেগুলো দখল করে নেয়। বিদ্রোহী সেনাদের মনোবল ভেঙে ফেলতে অকথ্য অত্যাচার শুরু করে কোম্পানি। লখনউয়ের কাছে আলমবাগ প্যালেসে জেমস উট্রাম-এর নেতৃত্বে ইংরেজদের একটা ছোট দল ঘাঁটি তৈরি করেছিল। বহু বার আক্রমণ চালিয়েও সেই ঘাঁটি ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অন্য দিকে সিপাহি বিদ্রোহকে দমন করতে লর্ড ক্যানিং

কৌশলী চাল চালতে শুরু করেন। ও দিকে কলিন ক্যাম্পবেল উন্নত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অওধ আক্রমণ করেন। বেগম হাতির পিঠে সামনে থেকে লড়াই চালিয়ে যান। সঙ্গে যোগ দেন ইংরেজদের ত্রাস বিপ্লবী আহমদুল্লাহ। নানাসাহেবের সঙ্গেও বেগম হাত মেলান।

অদম্য চেষ্টা সত্ত্বেও হার মানতে হয় বেগমকে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সিপাহিদের বিপর্যয়ের সংবাদ আসা শুরু হয়। আহমদুল্লাহকে হত্যা করে ইংরেজ বাহিনী, দুর্ভাগ্যের শিকার হন নানাসাহেবও। বেগমেরও দুর্ভাগ্য, অর্থের লোভে রাজা লালমাধব সিংহ ও বেণীমাধব বিশ্বাসঘাতকতা করেন। বেগমের সেনার মনোবলও ভেঙে পড়ে। তবুও তিনি প্রায় এক বছর ধরে প্রতিরোধের লড়াই চালিয়ে গেলেন। চাইলেই তিনি কোম্পানির শর্ত মেনে নিয়ে নবাবের মতো পেনশনভোগী হয়ে ভবিষ্যৎ জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। পরাধীন ভাবে এ রাজ্যে জীবন কাটাতে চান না বলে, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নেপালের কাঠমান্ডুতে আশ্রয় নেন তিনি। লখনউ ছেড়ে নেপাল যাওয়ার পথেও রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

তাঁর জীবনের শেষাংশ নিয়েও খুব বেশি কিছু জানা যায় না। ১৮৭৯ সালে মৃত্যু হয় তাঁর। প্রবাসে অবহেলায় কবরে শুয়ে আছেন, অথচ কোথায় তাঁর কবর তা জানা ছিল না দেশবাসীর। স্বাধীনতার কয়েক বছর পরে পরিবারের সদস্যদের দাবিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে এক অনুসন্ধান কমিটি এই স্মৃতিসৌধ খুঁজে বার করে।

বেগমের স্মৃতিতে লখনউয়ে একটি উদ্যানের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার তাঁর স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। সংখ্যালঘু মেয়েদের পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে বৃত্তি— ‘বেগম হজরত মহল ন্যাশনাল স্কলারশিপ’। ইংরেজ আমলের সূচনাপর্বে যে ভাবে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন তিনি, সে তুলনায় স্বীকৃতি পেয়েছেন কমই।

তবে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় কাজ করে চলেছেন তাঁর উত্তরসূরিরা। বেগমের বংশধর তালাত ফাতিমা রাজনৈতিক ভূমিকার পাশাপাশি দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষদের জন্য বেগমের অবদান নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেছেন। তাঁর স্মরণে এই পরিবারের আর এক সদস্য মাঞ্জিলাত ফাতিমা কয়েক বছর ধরে আয়োজন করছেন আলোচনাসভার। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে মেটিয়াবুরুজ সিবতানাবাদ ইমামবাড়াতেও আলোচনা হবে বেগমের জীবনের নানা দিক নিয়ে।